মুজিববর্ষে আশ্রয়ণ অধিকার ও বাংলাদেশ: একটি নৈতিক প্রেক্ষাপট

ড. আকিকুল হক*

Abstract:

The most striking developments in our study of Philosophy during the second half of the 20th century has been the growing interest among moral philosophers in applied philosophy. Moral issues such as racial and sexual equality, human rights, justice, world hunger, war, gender equality, punishment, developments, right to shelter, and eradicating poverty have become prominent. The right to shelter Agenda is a topic related to applied philosophy. The right to shelter is fundamental human rights. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health. In our everyday life many problems could be cited as significant on a global scale. There are economic, political, social, problems: problems of poverty, human rights, population control and others. Every country in the world has to realize and help to solve these problems in order to raise the quality of life and the development of the country. It is really happy that our present Government is adopting schemes to reconstruct and develop the poor under the programme of the right to shelter in the 'Mujib Centenary'. So, the main purpose of this article is to explain briefly the nature of the right to shelter and how our present Government is trying to solve it.

ভূমিকা:

বাসস্থানের অধিকার মানুষের সবচেয়ে অপরিহার্য মৌলিক মানবাধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর সঙ্গে অন্যান্য মানবাধিকার জড়িত। চলাফেরার স্বাধীনতা, নিরাপত্তার স্বাধীনতাসহ অন্যান্য অধিকার বাসস্থানের সাথে জড়িত। অনুন্নত ও গরিব রাষ্ট্রের জন্য আশ্রয়ণ সমস্যা একটি মারাত্মক ইস্যু। এই ইস্যুটি বিভিন্ন ধরণের নৈতিক সমস্যার সূতিকাগার। সমাজ, দেশ ও জাতির ওপর এর প্রভাব প্রকট ও ভয়ংকর, যা বিভিন্ন সামাজিক সম্যসার সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পুষ্টিহীনতা, অশিক্ষা, অসামাজিক কার্যকলাপ, পারিবারিক অসন্তোষ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, চুরি-ডাকাতি, ঝগড়া-বিবাদ, সন্ত্রাস, হতাশা, মাদকাসক্তি প্রভৃতি ছাড়াও আরো বড় বড় সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির মূল দর্শনই ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৭২ সালে তৎকালীন নোয়াখালী (বর্তমান লক্ষীপুর জেলা) জেলার রামগতিতে নদী ভাঙন কবলিত ভূমিহীন-গৃহহীন অসহায় পরিবারগুলোকে গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত করেন[১]। সত্যিকার অর্থে আশ্রয়ণ সমস্যা একটি নৈতিক সমস্যাও বটে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হতে ধীরে ধীরে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে উত্তরণ ঘটতে যাচ্ছে। উন্নত রাষ্ট্রে

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নিত হতে হলে নূন্যতম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আশ্রয়ণের ইস্যুটি সমাধান করা প্রয়োজন। মুজিব শতবর্ষে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আশ্রয়ণ প্রকল্প’-এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে আশ্রয়ণ অধিকারের প্রকৃতি, সমস্যা ও সমাধান নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

দর্শনের যে শাখা সমাজে বসবাসকারী মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়কে একটি সার্বজনীন মানদণ্ডের আলোকে আলোচনা করে তাকে নীতিবিদ্যা বলে। নৈতিকতার তাত্ত্বিক আলোচনা সার্থক হয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের মাধ্যমে। তাই অতি প্রাচীনকাল থেকে নীতিবিদগণ ব্যবহারিক জীবনের নৈতিক সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করতে পারেননি। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা (Practical Ethics) আমাদের সমাজ জীবনের ব্যবহারিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকে। যেমন- জাতি-বৈষম্য, লিঙ্গ-বৈষম্য, মানব ভ্রূণ হত্যা, গর্ভপাত, কৃপাহত্যা, চরম দারিদ্র্য এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতা, আশ্রয়ের অভাব (Lack of Shelter), অশিক্ষা, ব্যাধি ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানে আলোকপাত করা হয়ে থাকে। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার প্রবক্তারা যে দিকটির ওপর জোর দেন তা হলো আমাদের নৈতিক মূল্য-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি তথা নিয়মনীতিগুলোকে বাস্তব পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে। অ্যাংলো-আমেরিকান দার্শনিক এলেন উড (W. Allen Wood) বলেছেন, মানব কল্যাণ সম্পর্কিত যেকোনো দৃষ্টিভঙ্গিই নৈতিক। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও এর বন্টন যদি সুষম ও গণতান্ত্রিক হতো তাহলে বিদ্যমান উৎপাদন সামর্থ্য দিয়েই সমাজের বিশেষ করে অতি দরিদ্র সদস্যদের মৌলিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হতো। সমাজকে, রাষ্ট্রকে উন্নততর অবস্থানে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যাকে পরিবর্তনকারী ভূমিকা নিতে হয়।

পিটার সিঙ্গার (Peter Albert David Singer) তাঁর ‘ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা’ গ্রন্থে[২] ‘স্বদেশী ও ভিনদেশী [শরণার্থী]’ (Insiders and Outsiders) নামক নবম অধ্যায়ে আবাসন সমস্যা, শরণার্থী সমস্যা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আবাসন সমস্যা একটি সামাজিক সমস্যা। স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও শিক্ষার জন্য আবাসন সমস্যার সমাধান করা জরুরী প্রয়োজন। এজন্যই আবাসন সমস্যাকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

আশ্রয়ণ অধিকার ও বাংলাদেশ দৃশ্যপট:

বাংলাদেশে আবাসন সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা।মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার হলো আশ্রয়। বিশ্বের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জাতি ও রাষ্ট্রের জনগণের মানবাধিকার রক্ষার জন্য ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারন পরিষদ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ‘The Universal Declaration of Human Rights-UDHR’ সর্বসম্মতিতে গৃহিত হয়। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ত্রিশটি অনুচ্ছেদের মধ্যে আর্টিকেল বাইশ থেকে সাতাশ পর্যন্ত ৬টি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সমূহ বর্ণিত হয়েছে। এই অধিকারগুলো মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য বিধায় সমাজের সদস্য হিসেবে সকল মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। উল্লেখ্য ধারা-২৫(১) এ আমাদের আশ্রয়ের বিষয়টি বর্ণনা করা আছে। এই ধারাটি নিম্নরূপ:

নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্ত পর্যাপ্ত জীবন মানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবামূলক কার্যাদির সুযোগ এবং বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবন যাপনের অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।[৩]

আশ্রয় বলতে মানুষের সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাকে বোঝায়। বাংলাদেশের বিরাট জনগোষ্ঠী সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর আশ্রয় থেকে বঞ্চিত। পিটার সিঙ্গার উল্লেখ করেন, পারমানবিক যুদ্ধের কারণে পৃথিবীর অনেকস্থান ধ্বংসযজ্ঞের স্তূপে পরিণত হয়েছে। নিউক্লীয় বিস্ফোরণের পর বায়ুমন্ডলে সঞ্চারিত তেজস্ক্রিয় ধূলিরাশির (fallout) ফলে ঐসব অঞ্চলে বসবাসকারী আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। তাপ বিকিরণের উচ্চ মাত্রার কারণে অবশিষ্ট মানুষকে দূষিত বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হবে এবং খাদ্য ও পানি সংকট দেখা দিবে।[৪]

বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন তুলে ধরে পিটার সিঙ্গার বলেন, তৃতীয় বিশ্ব বিশেষ করে দরিদ্র দেশ সমূহের দারিদ্র্য ও বৈষম্যের অন্যতম কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর মূলে রয়েছে সম্পদ সমবন্টনের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, ভূমি সংস্কার ও সচেতনতার অভাব। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, পুষ্টিহীনতা, অসুস্থ স্বাস্থ্য, চরম দারিদ্র্য, বাসস্থানের অভাব, ক্ষুধা, অশিক্ষা, ব্যাধি, উচ্চ শিশু মৃত্যুহার, নিম্ন গড় আয়ু সব কিছুই খারাপ।[৫]

রবার্ট ম্যাকনামারা অনুসারে চরম স্তরের দারিদ্র্য মূলত অস্তিত্বের খুব প্রান্ত সীমায় অবস্থিত জীবন। চরম দরিদ্র জনগণ হলো অত্যন্ত বঞ্চিত মানব সত্তা, যারা অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রাম করে এবং নোংরা ও অধঃপতিত বা অমার্যাদাকর পরিবেশে বসবাস করে যে পরিবেশ আমাদের অত্যাধুনিক কল্পনাশক্তি ও বিশেষ সুবিধাবাদী কল্পনার বাইরে।[৬]

বর্তমানে বাংলাদেশেও আবাসন সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। এ বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে বিপুল পরিমান জমি, রাস্তাঘাট, শিল্পকলকারখানা ও অন্যান্য স্থাপনা বাবদ ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যাবে যে, এ বর্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রায় অর্ধশতকে দেশের ফসলি জমির পরিমাণ অর্ধেকে নেমে এসেছে। এসব ফসলি জমি ব্যবহৃত হয়েছে বাড়িঘর নির্মাণসহ অন্যান্য কাজে। মানুষের জীবনের তৃতীয় মৌলিক চাহিদা হলো তার বাসস্থান। আমাদের দেশে এ আবাসনের চিত্র খুবই ভয়াবহ। আনুমানিক প্রায় শতকরা ২৭ ভাগ মানুষের নিজস্ব ঘরবাড়ি নেই[৭]। অধিকাংশ লোক বাস করে আধাপাকা বা টিনের ঘরে কিংবা মাটির দেয়ালের ঘরে বা বস্তিতে। কিন্তু বিশ্বসভ্যতা প্রতিটি মানুষের বাসস্থান প্রাপ্তিকে অন্যতম মৌলিক অধিকার বলে।

বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালে জাতীয় গৃহায়ন নীতির সংস্কার ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (NHA) গঠনের মাধ্যমে একটি আইন প্রণয়ন করেছে। চরম দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিশেষ করে নদী ভাঙ্গনের প্রভাবে ব্যহত হচ্ছে। শহরাঞ্চলে আশ্রয়ের অভাবে অসংখ্য মানুষ বস্তির নোংরা পরিবেশে ফুটপাতে যত্রতত্র মানবেতর পরিবেশে বাস করছে। অনেক সময় সরকারি উদ্যোগে ছোট বড় অনেক বস্তি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে উচ্ছেদ করা হয়। ফলে বস্তিবাসী আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। আবার বর্ষা মৌসুমে প্রতিবছরই নদীর ভাংগনে অনেক মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করে। তাই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বাসস্থান সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। এক সময় বাংলাদেশকে

অনেকেই বিশ্বের বৃহত্তম গ্রামীণ বস্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো[৮]।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তি ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন যাতে, নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়ঃ ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।"

আশ্রয়ের মতো জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। গৃহায়ন সমস্যা মোকাবেলার লক্ষে সরকার ১৯৯৩ সালে 'National Housing Policy' প্রণয়ন করেন। জাতীয় গৃহায়ন নীতির মূল লক্ষ্য হলো সমাজের সর্বস্তরের লোকের গৃহায়নের ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং দরিদ্র ও আশ্রয়হীনদের গৃহায়নের ব্যবস্থা গৃহায়ন নীতির প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় গৃহায়ন নীতিতে বাংলাদেশের পল্লী ও নগরীর জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা নিরসনের কতিপয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গৃহায়ন নীতির বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো, দেশের আবাসন সংকট মোকাবেলায় সরকারের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা হিসেবে কতিপয় দিক চিহ্নিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় (i) গৃহ-উন্নয়নের অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা, (ii) জনগণকে উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করা, (iii) যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণের মাধ্যমে আবাসন সমস্যা মোকাবেলা করা ও (iv) শুধু স্বল্পবিত্ত, বিত্তহীন, দুর্দশাগ্রস্ত, সহায় সম্বলহীন ও আশ্রয়হীনদের জন্য সরকারি- বেসরকারি খাতে বিশেষ গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।[৯]

পল্লী এলাকার অর্থনৈতিক ক্রমাবনতি, ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং অন্যান্য কারণে প্রচুর লোক গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে আসছে। উদ্ভূত দ্রুত নগরায়ন প্রক্রিয়ায় শহরাঞ্চলে বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলোতে ছিন্নমূল মানুষের ভিড় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বস্তি ও স্বত্বহীন জনপদ গড়ে ওঠেছে। এ সকল জনপদে দরিদ্র জনগণ অত্যন্ত মানবেতর জীবন-যাপন করছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই ছিন্নমূল মানুষেরা কিন্তু নগরীর অর্থনীতিতে মূল্যবান অবদান রাখছে।

গৃহায়ন সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) কয়েকটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। । যেমন- (ক) দরিদ্র, দুঃস্থ, আশ্রয়হীন বস্তিবাসীদের গৃহায়ন ও পুনর্বাসনের জন্য স্বল্পব্যয়ে গৃহ ও বহুতল ভবন নির্মাণ, (খ) নিম্ন ও মধ্যবিত্তশ্রেণির লোকদের আবাসনের জন্য ভূমি উন্নয়ন, (গ) নিম্ন ও নিম্নমধ্যশ্রেণির লোকদের জন্য যুগ্মগৃহ (Condominiums) তৈরি করা, (ঘ) আবাসন সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে কর্মচারীদের নিকট ফ্ল্যাট বিক্রির ব্যবস্থা করা ও (ঙ) কর্মজীবী মহিলাদের জন্য গৃহায়নের বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।[১০]

আশ্রয়ণ ও দারিদ্র্যঃ

চরম দারিদ্র্য সম্ভবত বর্তমান মানুষের দুর্দশার প্রধান কারণ। শিল্পায়িত দেশগুলোর যে দারিদ্র্যের সাথে আমরা পরিচিত তা হচ্ছে আপেক্ষিক দারিদ্র্য। এর মানে দাঁড়ায় কিছু মানুষ তাদের প্রতিবেশীদের দ্বারা ভোগকৃত সম্পদের তুলনায় দারিদ্র্য। চরম দরিদ্র জনগণ হচ্ছে অত্যন্ত বঞ্চিত মানবসত্তা। তারা অবহেলিত ও অমর্যাদাকর পরিবেশে বসবাস করে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে যে পরিবেশ আমাদের

পরিশীলিত করে, যে পরিবেশ আমাদের পরিশীলিত চিন্তাশক্তি এবং সুবিধাবাদী কল্পনার বাইরে।[১১]

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি কৃষি ভিত্তিক উন্নয়নশীল দেশ। এদেশ উন্নয়নশীল হলেও এ দেশে আজ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ ডিজিটালের সকল ক্ষেত্রেই লেগেছে উন্নয়নের ছোয়া। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হলেও দেশটি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। সাধারণত দারিদ্র্য বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় মানুষ তার উপার্জিত আয় দ্বারা তার জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। ওরলি এম. অ্যামোস জুনিয়র এর মতে, "Poverty is the condition in which people do not have the basic necessities of life, and lack of the income to buy them."[১২] আসলে দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। বিশেষ করে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি পূরণের অক্ষমতার নামই হলো দারিদ্র্য। নতুন সহস্রাব্দে বিশ্বের পিছিয়ে পড়া দেশ সমূহের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিগত ২০০০ সালে ৮টি উন্নয়ন লক্ষ্য সম্বলিত Milenium Development Goals or MDG নির্ধারণ করা হয়। ২০০৮ সালের উন্নয়ন তালিকায় বাংলাদেশগউএ অর্জনের পথে অগ্রগামী আছে।[১৩]

দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রদের পুনর্বাসনের জন্য বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। গ্রামীণ পর্যায়ে গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের মাধ্যমে বস্তির প্রসার নিয়ন্ত্রণ ও দারিদ্র্য বিমোচন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্প ছিন্নমূল ও গৃহহীনদের গ্রামীণ পর্যায়ে পুনর্বাসিত করে, শহরে বস্তির প্রসার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের পরিচালনায় ব্যারাকের মতো আধাপাকা টিনের বিশাল ঘরে অনেকগুলো পরিবারকে মৌলিক আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত রাষ্ট্রে উত্তোরণ ঘটাতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে নূন্যত আবাসন তথা আশ্রয়হীনদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং ধারাবাহিকভাবে সেগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হচ্ছে দরিদ্রতা। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের শর্তপূরণ করতে হলে অবশ্যই দারিদ্র্য সীমা কমিয়ে আনতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্র্য সীমা আগের চেয়ে অর্ধেকে নেমে এসেছে[১৪]। MDG শর্তানুসারে অসহায় প্রান্তিক-জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করতে হবে। বর্তমানে দেশ এ লক্ষ্যটি অর্জনে বেশ সাফল্যের পথে রয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীন-গৃহহীন ছিন্নমূল মানুষকে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় আনছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন [মুজিববর্ষে] বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের ৬৪ জেলার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের তালিকা করা হয়। এ তালিকায় সংযোজন-বিয়োজন উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ৪ লাখ ৪২ হাজার ৬০৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া তালিকাভুক্ত সব পরিবার পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসিত হবে।[১৫]

কক্সবাজার ও অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৯৭ সালের ১৯ মে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ মে টেকনাফ উপজেলার সেন্টমার্টিন পরিদর্শন করে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন গরিব পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের নির্দেশনা দেন। প্রধানমন্ত্রী সে বছরই দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষদের জন 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' চালু করেন।[১৬]

আশ্রয়ণ ও টেকসই উন্নয়ন:

'আশ্রয়ণ' শব্দটি সংকীর্ণ ও ব্যাপক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংকীর্ণ অর্থে কেবল আবাসনের ব্যবস্থাকে বোঝায়। অপরদিকে, ব্যাপক অর্থে এর পরিধি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এক্ষেত্রে কেবল ছিন্নমূল মানুষের আবাসন সমস্যার সমাধানই নয়, এর পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের মৌলিক উপকরণগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে সে উপাদানগুলো সরবরাহ করে সংশ্লিষ্ট চাহিদাগুলো ভোগ করতে সহায়তা করা।

বর্তমানে আশ্রয়ণের এই ব্যাপক অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত রেখে দরিদ্র মানুষেরা দুই শতাংশ করে জমি পেয়েছেন; একটি অর্ধপাকা দুই কক্ষের ঘর, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং এতে রয়েছে গোসলখানা, টয়লেট ও রান্নাঘর। গৃহসহ ভূমির মালিকানার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে দলিল দেওয়া হয়েছে। সুন্দর পরিবেশ রক্ষার্থে প্রকল্প এলাকায় গাছ লাগানো হয়েছে। এছাড়া প্রতি দশটি পরিবারের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা হিসেবে নলকূপ রয়েছে। অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে রয়েছে- স্বাস্থ্যসেবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক এবং আশ্রায়ণের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিও জোর দেওয়া হয়েছে; যেমন- শিশু-কিশোরদের শরীর গঠন ও চিত্ত বিনোদনের জন্য আশ্রায়ণ এলাকায় রয়েছে খেলার মাঠ, মিনি পার্কের মতো কিছু সুযোগ সুবিধা। এক কথায় বলা চলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক গ্রামের সব নাগরিক সুবিধাই এখানে বিদ্যমান থাকবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম উৎস বা চাকা হলো মানব সম্পদ। জনসংখ্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং কারিগরিও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের মাধ্যমে জন সম্পদ বা মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। এই নিঃস্ব দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে এদের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পেশামুখী ১০ দিনের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে- আশ্রায়ণে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য মৎস চাষ, নার্সারি, পাটি বুনন, নকশি কাঁথা, ওয়েল্ডিং, ইলেক্ট্রিক ওয়ারিং এবং রিকশা-সাইকেল-ভ্যান গাড়ী মেরামতের মতো ৩২টি পেশায় প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। এসকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত করার জন্য তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হবে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে বিভিন্ন সম্পদ দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকলেও যদি উন্নত ও দক্ষ মানব সম্পদ না থাকে তবে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হবে না। ফলে উন্নয়ন ব্যহৃত হবে এবং কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে না। আমরা যদি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির দিকে নজর দেই তবে দেখা যাবে উন্নয়নের সূচনা লগ্নে প্রতিটি দেশই তাদের মানবসম্পদ উন্নয়নের দিকে বিশেষ জোর দিয়েছিল। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আশ্রায়ণের সুবিধাভোগীরা প্রশিক্ষণ চলাকালে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে নজর রেখে প্রতিদিন ৭৫০ টাকা ভাতা দেওয়া হয়[১৭]।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী শাসন আমলে উপনিবেশিক শাসন ও শোষণ এদেশে অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠেনি। অনুন্নত কৃষি, দুর্বল শিল্প কাঠামো, বেকারত্ব, দূর্নীতি স্বল্প মাথা পিছু আয়- এ সবই ছিল

স্বাধীনতা উত্তর-কালে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি। প্রবৃদ্ধিও মৌলিক চাহিদা সম্বলিত মাপকাঠির নাম হচ্ছে "মানব উন্নয়ন সূচক।" মানব উন্নয়ন সূচকের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা । অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের একটি মাপকাঠি হচ্ছে পুঁজি উৎপাদন অনুপাত। এ মাপকাঠি অনুযায়ী যে দেশে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের তুলনায় পুঁজির অনুপাত বেশি সে দেশ তত উন্নত। আশ্রায়ণে বসবাসকারী দরিদ্রের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে জীবিকা নির্বাহের জন্য সহজ শর্তে ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত মূলধন হিসেবে ঋণ পাচ্ছেন। মানব সম্পদে এ সকল নিঃস্ব লোকদের অর্ন্তভূক্তি করার লক্ষ্যে আশ্রায়ণে বসবাসকারী পরিবার প্রাথমিকভাবে প্রতি তিন মাসের ভিজিএফের আওতায় ভাতা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, মাতৃত্বকালীন, বয়স্ক, বিধবা বা অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর আওতায় ভাতা প্রাপ্তিতে এ সকল সুবিধাভোগীরা অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। উন্নয়নের অংশীদারিত্ব হিসেবে একজন নিঃস্ব ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মানব সম্পদে পরিণত করে আত্ম প্রত্যয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals= SDG) অর্জন এখন আমাদের সময়ের দাবি। এই লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তি ছিল গউএ অর্জন। বাংলাদেশ সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে MDG অর্জনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। SDG এর আরেক নাম 'আমাদের ধরিত্রীর রূপান্তর ঃ টেকসই উন্নয়ন ২০৩০ এজেন্ডা'। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ (MDG) অর্জনে সক্ষম হয়েছে। MDG অর্জনে সক্ষমতা দেখিয়ে বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। উপরোন্ত SDG অর্জনের আরেকটি শর্ত হলো ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ ও ডিজিটাল ক্ষেত্রে সফলতা দেখাতে হবে। দারিদ্র্য দূর করাই ২০৩০ এর প্রধান লক্ষ্য। দারিদ্র্যের প্রকাশ বহুমাত্রিক আর তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে অপুষ্টি, অশিক্ষা, সামাজিক বৈষম্য, দুর্বল স্বাস্থ্য প্রভৃতি।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক অমর্ত্য সেন তাঁর 'উন্নয়ন ও সক্ষমতা' ও 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে- খাদ্য ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধার ওপর জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ বা অধিকার প্রতিষ্ঠাতে অসামর্থ্য হওয়ার কারণেই, স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই সমাজে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যদশা দেখা দেয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরস্বপ্ন বাস্তবায়নের জন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পদের সুষম বন্টনের লক্ষ্যে ও SDG অর্জনের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে হত দরিদ্র ভিক্ষুক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষকে ভূমি ব্যবহারের আওতায় এনে অন্যান্য সামাজিক সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জলবায়ু উদ্বাস্তু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ, বেদে, দলিত, হরিজনসহ সমাজে পিছিয়ে পড়া অন্যান্য সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এ কর্মসূচীতে। বিশ্বে এটি প্রথম ও সর্ববৃহৎ উদ্যোগ, যাতে রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতে তুলে আনার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে।[১৮]

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক বা অন্য কোন সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা। সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে উন্নত দেশের তুলনায় অনুন্নত দেশে এ ধরনের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম। সামান্য খাদ্য সহায়তা ছাড়া সত্তরের দশকে বাংলাদেশে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। উন্নত দেশের অনুরূপ বেকার ভাতা প্রদানের কোন প্রথাই ছিল না । তবে বিগত প্রায় তিন দশকে বাংলাদেশে এ ব্যবস্থার মাত্রা, আকার ও ধরনের প্রসার ঘটেছে[১৯]।

জন রলস্‌ও তাঁর *A Theory of Justice* গ্রন্থে সমাজের নি:স্ব পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী (least advantaged people) ভাগ্যোন্নয়ের কথা বলেছেন। তিনি কম সুবিধাভোগী বলতে ঐ সকল জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন যারা (ক) অদক্ষ এবং যাদের গড় পড়তা মাথাপিছু আয়ও সম্পদ মধ্যম শ্রেণির এবং (খ) যাদের আয়ও সম্পদ অর্ধেকেরও কম[২০]। তিনি পরবর্তীকালে Kantian Constructivism in Moral Theory প্রবন্ধে কম সুবিধাভোগী বলতে ঐ সকল জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন (ক) যারা দরিদ্র এবং যাদের জন্ম নিম্ন শ্রেণির পরিবারে (খ) যারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে নিঃস্ব ও সর্বশান্ত এবং (গ) যাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়।[২১] এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি জন রলসের মতোই বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ধনী-গরীবের ব্যবধান হ্রাস করার লক্ষ্যে এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈতিক দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও ঘূর্ণিঝড় দুর্গত গৃহহীন মানুষের জন্য নোয়াখালী জেলার চর পোড়াগাছায় গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ও তাঁর অসমাপ্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনে ছিন্নমূল, ভূমিহীন, গৃহহীন অসহায় পরিবারসমূহের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করেন। ঋণ ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে ছিন্নমূল, ভূমিহীন, গৃহহীন, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তোলা আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম নৈতিক বৈশিষ্ট্য।

আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সব নাগরিকদের জন্য মৌলিক উপকরণ প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ৩.১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য হ্রাস এবং সবার জন্য বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

পরিবেশ, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের ও ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার পূর্ণতা পেয়েছে। আশ্রয়ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন উভীষ্ট (SDG) এর ১। দারিদ্র্যের অবসান, ২। ক্ষুধা নির্মূল, ৩। স্বাস্থ্যসেবা, ৪। মানসম্মত শিক্ষা, ৫। লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, ৬। সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন, ৮। উপযুক্ত কর্মসংস্থান, ৯। অসমতা কমিয়ে আনা এবং ১০। টেকসই ও নিরাপদ জনবসতির মতো অনেক লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য আসছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু স্বদেশীদের সমস্যা সমাধান হয়নি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ সমস্যা ভিনদেশী (outsiders) (শরণার্থী) রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক প্রশংসা এনেছে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলা করা শুধু মাত্র বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারণার প্রচলন ছিল। মৃত্যু এবং রোগ ব্যতিত চরম দারিদ্র্য অপর্যাপ্ত খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাসহ জনগণের জীবন ধারণের দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। বিশ্বব্যাংক আয়ের স্তর দ্বারা চরম দারিদ্র্য সংজ্ঞায়িত করে। বিশ্বব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী চরম দারিদ্র্যের আয়ের স্তর জনগণকে পর্যাপ্ত পুষ্টিজনিত খাদ্য সরবরাহে অপ্রতুল এবং এরূপ আয়স্তরের জনগণ প্রায় ৮০ কোটি যা উন্নয়নীশল দেশের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ। এই পরিমাণ জনসংখ্যা চরম দারিদ্র্যে বসবাস করে। চরম দারিদ্র্য সম্ভবত বর্তমান মানুষের দুর্দশার প্রধান কারণ।[২২] এছাড়া, বৈদেশিক সাহায্য, খাদ্য সহায়তা, ত্রাণপ্রদান এবং ক্ষুদ্র ঋণের নামে শোষণ ও বঞ্চনার কারণে একজন দরিদ্র ব্যক্তি চরম দারিদ্র্যদশার মধ্যে পতিত হয়।

পিটার সিঙ্গারের মতে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন না করার চেয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার দায়িত্বের ধারণাটি অধিকতর বিভ্রান্তিকর। যাদের দুর্দশার জন্য আমরা দায়ী তাদের সাহায্য করার জন্য আমরা একদিকে নিজেদেরকে একটি বৃহত্তর বাধ্যবাধকতার অধীনস্থ বলে মনে করি। বিপরীতক্রমে, যেকোন পরিনামবাদী জোর দিয়ে বলবেন যে, আমাদের সকল কাজের পরিণামের জন্য আমরাই দায়ী, এবংএকটি বিলাস সামগ্রীরজন্য আমার অর্থ খরচের কারণে যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। তবে এ ধারণাও সত্য যে, আমি কখনও অস্তিত্বশীল না থাকলেও ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারতো। এ প্রসঙ্গে পিটার সিঙ্গার অ-পরিণামবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যদি প্রত্যেকের জীবনের অধিকার থাকে এবং এই অধিকার যদি আমার জীবনের সংকটকালে সাহায্যকারীর বিরুদ্ধে না হয়ে আমার জীবনের ভীতি প্রদর্শনকারীর বিরুদ্ধে হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, জীবন রক্ষার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন না করার জন্য নয় বরং হত্যার কার্যটি সম্পাদনের জন্যই আমরা দায়ী। পিটার সিঙ্গার দরিদ্র লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করার প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণ ঘটনাক্রমে এক সময়ে পারস্য উপসাগরের বালুকাময় জনবসতিশূণ্য এলাকায় বসবাস করতো তারা এখন সেই বালুর তলদেশে তেলের স্তর থাকার কারণে অবিশ্বাস্য রকমের সম্পদশালী। অন্যদিকে, যাদের পূর্ব পুরুষগণ এক সময়ে সাহারার দক্ষিণ এলাকার উর্বর ভূমিতে বসবাস করতো তারা বর্তমানে খরা ও খারাপ ফলনের কারণে চরম দারিদ্র্যে বসবাস করে।[২৩]

মানুষের বন্টিত এ ব্যবস্থা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া দারিদ্র্যের বিষয়টি দেখা যাচ্ছে অনেকাংশে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। তাই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী লোকদের আশ্রয়ণ অধিকার ও অন্যান্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের নৈতিক দৃষ্টিতে গ্রহণীয়।নীতিবোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে বাসস্থানহীন দারিদ্র্যদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাদের উন্নয়নের মাধ্যমে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। থমাস পোগেও নিকোলে রিপ্পিন (Thomas Pogge and Nicole Rippin) একটি গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন দারিদ্র্যের আয়, সম্পদ, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা সেবা, বাসস্থান এবং আশ্রয়ের ক্ষেত্রে স্বল্পতা রয়েছে। তাদের অনেকেই অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য কিনতে বাধ্য হয় এবং তারা পরিবারের স্বাস্থ্য ও জীবনের অনেক মুমূর্ষু অবস্থায়ও চিকিৎসাসেবা নিতে পারে না। এ সকল দরিদ্র মানুষের কোন স্থায়ী বাসস্থানও থাকে না। তাদের রাস্তায় জীবন কাটাতে হয়।[২৪] তাই এই আশ্রয়ণ অধিকার সমস্যাটি একটি নৈতিক সমস্যাও বটে এবং তা মানব মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত।

পিটার সিঙ্গার আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের সাহায্যের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দিলেও থমাস পোগের নৈতিক কাঠামোর ভিত্তি হলো মানব অধিকার। পোগে তাঁর মানব অধিকারের মধ্যে 'আর্থ-সামাজিক' অধিকারকেও অন্তর্ভূক্ত করেন। আশ্রয়ণ সমস্যা সম্প্রতি একটি বিশ্বতাত্ত্বিকসমস্যা হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। তাই এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমাজের তথা ব্যাপক অর্থে একটি দেশের উন্নয়ন। আশ্রয়ণ সমস্যাটির সমাধান হলে বহুমুখী সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে এবং পরিণতিতে সমাজের উন্নয়ন ঘটবে। আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের কেবল সাহায্য নয় বরং তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের যদি আশ্রয়ের ব্যবস্থা বা অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয় তাহলে সেটি হবে কল্যাণময় কাজ। আবার কোন ব্যক্তিকে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দিয়ে যদি তার অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা যায় এবং তা স্থায়ী রূপ লাভ করে তাহলে সেটি হবে উন্নয়ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ব্যক্তিকে একটি মাছ খাওয়ার জন্য দিলে

সেটি হবে তার কল্যাণ আর লোকটিকে কিভাবে মাছ ধরতে হয় তা যদি শিখানো হয় তখন সেটি হবে উন্নয়ন।[২৫]

আশ্রয়ণ সমস্যাটি নৈতিক সমাধানের সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকার ভোগীদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় আনার লক্ষ্যে তাদেরকে ঘরসহ ভূমির মালিকানা পাওয়ার পাশাপাশি তারা আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের মেধা ও শ্রম দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সুবিধাভোগী ব্যক্তিও পরিবার হীনমন্যতা কাটিয়ে একটি সম্মানজনক জীবন-জীবিকা নির্বাহ করার স্বপ্ন দেখছে। এভাবেই দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নে অংশীদারিত্ব করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। আশ্রয়ণ প্রকল্প বাংলাদেশের দারিদ্র্যতা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মার্থা নাসবাম (Martha Nussbaum) দারিদ্র্যতার বহুমুখী ধারণাগত তাত্ত্বিক প্রভাবকে বিবেচনা করে দশটি খসড়া উপাদানকে নির্দেশ করেছেন। এগুলো হলো: (১) জীবনের প্রত্যাশ্যা (২) দৈহিক স্বাস্থ্য, মৌলিক চাহিদাসমূহ (বাসস্থান, খাদ্য ইত্যাদি) (৩) আক্রমণ হতে মুক্তি (৪) শিক্ষার সুযোগ (৫) আবেগমূলক স্বাস্থ্য, ভয় ও উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্তি (৬) মানসিক স্বাস্থ্য (৭) সামাজিক অন্তর্ভূক্তি, বৈষম্য থেকে মুক্তি ও আত্মসম্মান (৮) স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ (৯) অবসর (১০) রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, উপযুক্ত কাজ ও সম্মতি ধরে রাখার যোগ্যতা।[২৬] ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কল্যাণমূলক অর্থনীতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে এই নতুন পদ্ধতি ইতোমধ্যে 'শেখ হাসিনা মডেল'হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

'শেখ হাসিনা মডেলে'র[২৭] মূল বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

(ক) উপার্জন ক্ষমতা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা; (খ) সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা পুন:প্রতিষ্ঠা করা; (গ) নারীদের ঘরের অর্ধেক মালিকানা দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন; (ঘ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন; (ঙ) ব্যাপকহারে বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশের উন্নতি সাধন এবং (চ) গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির মূল দর্শনই ছিল গরিব দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ কন্যা সে লক্ষ্য পূরণে দিন-রাত কাজ করে চলেছেন। 'বাদ যাবে না একটি মানুষও'- এই মূলনীতিকে[২৮] সামনে রেখেই তিনি সব উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলাদেশ'- এর দিকে ক্রমেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আশা করা যায় উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশে যেমন রয়েছে ইকোসিস্টেম অনুরূপভাবে সমাজেও রয়েছে সামাজিক ইকোসিস্টেম। এই সামাজিক ইকোসিস্টেম ভারসাম্য বজায় রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের মৌলিক অধিকার পূরণ করে ধনী-গরীবের ব্যবধান হ্রাস করে, উন্নয়নের স্রোত ধারা অব্যাহত রেখে একটি সুখী ও সমৃদ্ধদেশ গড়ে তোলাই হবে আজকের দিনের নৈতিক লক্ষ্য।

তথ্যসূত্র:

১. এম.এম. ইমরুল কায়েস, 'আশ্রয়ণ প্রকল্প: অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল, ' দৈনিক বাংলাদেশ বুলেটিন, তারিখ-১০.০৭.২০২১, পৃ.-৪।

২. Peter Singer, Practical Ethics, Second Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

৩. Article-25(1): Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

৪. The global level of radioactivity now and for about eight years to come is so high that only those living in fallout shelters can be confident of surviving in reasonable health. For the rest, who must breathe unfiltered air and consume food and water with high levels of radiation, the prospects are grim. Peter Singer, Practical Ethics, Second edition, Cambridge University Press, 1999, P.-247.

৫. `... I assume that absolute poverty, with its hunger and malnutrition, lack of shelter, literacy, disease, high infant morality and low life expectancy, is a bad thing.' Peter Singer, Practical Ethics, Second Edition, Cambridge University Press, 1999, P-230.

৬. Peter Singer, Loc.cit, P-219- রবার্ট ম্যাকনামারা (Robert Strange McNamara) ১৯৬৮-৮১ পর্যন্ত বিশ্ব ব্যাংকের সভাপতি ছিলেন।

৭. মোঃ রফিকুল ইসলাম, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা, রাদ্ধ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ-৩০২।

৮. মোঃ আতিকুর রহমান, মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার, অনার্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২০৭।

৯. ঐ, পৃ.-২০৯-২১১।

১০. ঐ, পৃ.-২১৩।

১১. ড. প্রদীপ কুমার রায় (অনুদিত), ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.-১৫০।

১২. Orley M. Amos Jr., Microeconomics, Concepts, Analysis and Application, Wads worth publishing Co. Belmont, California, 1987, P.-565.

১৩. সুকেশ চন্দ্র জোয়ারদার, 'বাংলাদেশের অর্থনীতি, মিলেনিয়াম প্রকাশনী, ঢাকা, আগস্ট-২০১৫, পৃ.- ৫৪।

১৪. ঐ।

১৫. এম.এম. ইমরুল কায়েস, প্রাগুক্ত, পৃ.-৪।

১৬. এম.এম. ইমরুল কায়েস, প্রাগুক্ত।

১৭. ঐ, পৃ. ৪।

১৮. ঐ ।

১৯. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, বাংলাপিডিয়া, [http:/www.bn.banglapedia.org, date16.06.2022;time 10am]।

২০. John Rawls, A Theory of Justice, Oxford, Oxford University Press, 1971, P.-10.

২১. John Rawls, "Kantian Constructivism in Moral Theory" Journal of Philosophy, 77, 1980, P-96.

২২. ড. প্রদীপ কুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৫১।

২৩. ঐ, পৃ.-১৫৭-১৬৫।

২৪. Thomas Pogge and Nicole Rippin, Universal Agenda on the Miltiple Dimensions of Poverty, Back-ground Research Paper, submitted to the High level Panel on the Post-2015, Development Agenda, May-2013, (www.post2015.hlp.org) dated-07.11.2016, PP 17-18.

২৫. ড. খুরশিদ আলম, উন্নয়নমূলক সমাজ বিজ্ঞান, ঢাকা: মিনার্ভা পাবলিকেশন্স বাংলা বাজার, জুন-২০০০, পৃ. ২৭৪-২৭৫।

২৬. Martha Nusbaum, in Thomas Pogge and Nicole Rippin, Universal Agenda on the Multiple Dimensions of Poverty, op. cit. P.-10.

২৭. এম.এম. ইমরুল কায়েস, 'আশ্রয়ণ প্রকল্প: অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল,' দৈনিক বাংলাদেশ বুলেটিন, তারিখ-১০.০৭.২০২১, পৃ.-৪।

২৮. এম.এম. ইমরুল কায়েস, ঐ।